FEB. 01 2002

তারিখ ... পৃঃ ৬ কলাম ৭

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের হাল-হকিকত

'ঢাকা শহরের বিভিন্ন সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয় না। টয়লেটের অবস্থা নাজুক। খাবারের বিশুদ্ধ পানি নেই। অপরিসর শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীদের গাদাগাদি, ঠাসাঠাসি করে পড়াশুনা করতে হয়। স্কুলে পড়াশোনার মান সন্তোষজনক না থাকায় অভিভাবকরা [illegible] হয়ে প্রাইভেট শিক্ষকের শরণাপন্ন হচ্ছেন। আতংকজনক হলে সত্য ঘিঞ্জি বস্তি এলাকার কোন কোন স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের কারো কারো স্কুলব্যাগে ড্রাগ সরবরাহ করা হচ্ছে।' গত রবিবার ডেমোক্রেসি ওয়াচ ট্রেনিং প্রোগ্রাম আয়োজিত 'সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার মান' শীর্ষক একটি গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশকালে এই তথ্য উদঘাটিত হইয়াছে। এতদ্‌সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট গত মঙ্গলবার দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত হয়।

ডেমোক্রেসি ওয়াচ পরিচালিত এই গবেষণা কার্যক্রমে রাজধানী ঢাকার ৭টি সরকারী স্কুল অন্তর্ভুক্ত ছিল। ৩টি দলে মোট ১০ জন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র এই গবেষণা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে। একথা সত্য যে, ৭টি স্কুলের উপাত্ত দিয়া দেশের সরকারী-বেসরকারী ৮০ হাজার প্রাথমিক স্কুলকে বিচার করা যাইবে না। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের সচিব ডেমোক্রেসি ওয়াচের প্রতিবেদন প্রকাশনা অনুষ্ঠানে এই মন্তব্য করিয়াছেন। কিন্তু মহানগরীর সরকারী প্রাথমিক স্কুলগুলির তুলনায় দেশের অন্যান্য স্থানের প্রাথমিক স্কুলসমূহের অবস্থা যে খুব একটা ভিন্ন হইবে, তাহা আশা করা যায় না।

সমগ্র দেশে সরকারী-বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির হাল-হকিকত পর্যালোচনা করিলে খুবই নাজুক অবস্থা দৃষ্টিগোচর হয়। গত বৎসরে পত্রিকায় প্রকাশিত এক সংবাদে দেখা যায় ফেনীর সোনাগাজী থানার চর চান্দিয়া ইউনিয়নের সওদাগরহাট সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়টিতে ৫৮০ শিক্ষার্থীর জন্য মাত্র ৩ জন শিক্ষক রহিয়াছে। অন্যদিকে সিলেট জেলার ১১টি উপজেলায় প্রায় ২ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্কুলের খাতায় ছাত্রের সংখ্যা আর বাস্তব চিত্র ভিন্ন। অন্য এক রিপোর্টে দেখা যায়, গাইবান্ধার ১৬টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক নাই। বিদ্যমান প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষকের স্বল্পতা, স্কুল ভবনের অভাব, খোলা আকাশের নীচে বসিয়া ক্লাস করা, চেয়ার, টেবিল, বেঞ্চ, ব্লাকবোর্ডসহ অন্যান্য আসবাবপত্র ও শিক্ষা উপকরণের সংকট, বিলম্বে বিনামূল্যের বই সরবরাহ, নিষিদ্ধ নোটবই ও গাইড বইয়ের অবাধ প্রচলন, শিক্ষামানের ক্রমাবনতি, ভর্তি সমস্যা ইত্যাদি সমস্যায় গোটা প্রাথমিক শিক্ষাই আজ দুর্দশাগ্রস্ত।

১৯৪৮ সালের ১০ই ডিসেম্বর জাতিসংঘ গৃহীত সার্বজনীন মানবাধিকারে প্রাথমিক ও মৌলিক পর্যায়ের শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক ঘোষণা করা হয়। বলা হয়, প্রত্যেকেরই শিক্ষা লাভের অধিকার রহিয়াছে। বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার ইতিহাস একশত বৎসরের হইলেও প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা হয় মাত্র ১৯৯২ সালে। দারিদ্র্যের কারণে কোন শিশু যাহাতে শিক্ষার আলো বঞ্চিত না হয়, উহার প্রেক্ষাপটে শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচী চালু হয়। একই সঙ্গে পশ্চাৎপদ নারী সমাজকে আগাইয়া নিতে নারী শিক্ষাকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক করা হয় এবং ছাত্রী উপবৃত্তি কার্যক্রম প্রবর্তন করা হয়। বিগত বছরগুলিতে শিক্ষার হার বা স্বাক্ষরতার হার দ্বিগুণ হইয়া ৫১ শতাংশে উন্নীত হইয়াছে। কিন্তু লক্ষণীয় এই যে, শিক্ষার প্রাথমিক পর্ব শেষ না হইতেই শতকরা ৪০ ভাগ ছাত্র ঝরিয়া পড়ে এবং শতকরা ১০ ভাগ শিশু আদৌ বিদ্যালয়ে ভর্তি হয় না। এই অবস্থার চিত্র বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার জন্য মোটেই সুখকর নহে।

বিগত সরকারের আমলে জাতীয় শিক্ষানীতি-২০০০ ঘোষণা করা হয়। উহাতে প্রাথমিক শিক্ষার মেয়াদ ধরা হয় ৮ বৎসর। মাতৃভাষার মাধ্যমে একই মান ও বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন শিক্ষা ব্যবস্থা ইবতেদায়ী মাদ্রাসাসহ সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চালুর উল্লেখ করা হয়। বলা হয়, প্রথম [illegible] দ্বিতীয় শ্রেণীতে ইংরাজী অতিরিক্ত বিষয় হিসাবে পড়ানো হইবে। তৃতীয় শ্রেণী হইতে ইংরাজী বাধ্যতামূলক হইবে। তৃতীয় শ্রেণী হইতেই বাধ্যতামূলক ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার ব্যবস্থা রাখা হয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিশেষত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির উন্নয়ন নিশ্চিত করিয়া সরকার যদি শিক্ষার মান উন্নয়নে আন্তরিক ও যত্নবান হয়, তাহা হইলে দেশে শিক্ষার হার আরও বাড়িয়া যাইতে বাধ্য। শিক্ষিত ও দক্ষ জনশক্তি একটি জাতিকে অগ্রসরমান করিতে পারে, অশিক্ষিত জনসংখ্যা জাতির অগ্রগতির জন্য সর্বদাই ভারবাহী।